জীবনের প্রজ্ঞাপাঠ

মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

চিন্তা করা, চিন্তা গড়া	৯
মনোজগৎ ও মনোবিজ্ঞানী	১৩
ভাবনার ভাঁজে ভাঁজে	১৮
জানার ব্যগ্রতা	২০
আত্মবিশ্বাস, বিশ্বাসের আত্মা	২৩
বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর	২৮
কেমন তারুণ্য চাই	৩১
সুপারম্যান	৩৪
বিজয়ের জন্য	৩৬
দূরত্ব বজায় রেখে চলা	৩৯
কষ্টের পরে নয়; কষ্টের সাথেই স্বস্তি	৪২
দুই খরগোশের পেছনে দৌড়াতে নেই	৪৬
ধৈর্যই ধন, ধৈর্যই বীরত্ব	৪৮
অসার চাকচিক্য	৫১
ভুল স্বীকার পরিশীলনের সদর দরজা	৫৩
ভুল স্বীকারের ‘রেওয়াজ’ করি	৫৫
একটু ঝাঁজ, একটু ‘ফাকজি মা আনতা কাজ’	৫৮
দুটি পা বা দুটি ক্রাচ	৬১
বুদ্ধিতে হয় সিংহ বধ	৬৪
প্রেমের শক্তি, প্রেমের সৌন্দর্য	৬৮
ভালোবাসার বীজ	৭২
অঙ্কুর থেকে শিক্ষা	৭৫
পাষাণে পেষণ, মেহেদি পাতার রং	৭৭
শক্তিশালী প্রচারমাধ্যম	৮০
সম্প্রীতি অর্জিত সম্পদ নয়, স্রষ্টার দান	৮২
ঝরনার প্রবাহ নিজেই পথ করে নেয়	৮৪
সাধারণ ব্যর্থতায় অসাধারণ সাফল্য	৮৭
সৌন্দর্যময় কোমল সাক্ষাৎ	৮৯
অপেক্ষার প্রহর, অপেক্ষার প্রহরা	৯২

না সমালোচনা, না সমগ্রতায়	৯৫
চিবুক টেনে একটু 'দুষ্টুমি' করুন	৯৭
কষ্টের বদলায় পুরস্কার দিন	৯৯
বন্ধুত্বের স্নিগ্ধ বন্ধন	১০৪
একটুখানি বলতে জানা	১০৬
একটু অনুতাপ, নিমিষেই মোছে পাপ	১১০
স্বাধীন, কিন্তু কতটুকু স্বাধীন	১১৩
ইতিহাসকে স্মরণ করা	১১৬
দারিদ্র্যও শক্তি	১১৯
মানুষে যেন মূলের কথা মনে রাখে	১২২
পোকামাকড় এড়িয়ে চলুন	১২৫
আত্মহনন নয়; আত্মজাগরণ	১২৯
সুযোগ থাকলে কর্জ দিন	১৩১
মিষ্টি-মধুর কুশলী আচরণ	১৩৩
নেতৃত্ব ধন নয়, ভারী দায়িত্ব	১৩৬
দাওয়াতের ভাষা ও অধিকার আদায়	১৩৮
পরীক্ষায় পরিশীলন, পরীক্ষাও পুরস্কার	১৪২
অসুস্থ হলে পাশে একটি বই রাখুন	১৪৫
প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত থাকতে নীতিকবিতা পড়ুন	১৪৯
মানুষের জীবনে বৃক্ষের ধ্রুবপাঠ	১৫৩
পানাহ চাই, সূচনায় সমাপ্তিতে	১৫৮

চিন্তা করা, চিন্তা গড়া

চিন্তা শুধু করলে হয় না; চিন্তা গড়তেও হয়।

চিন্তা গড়া মানে নিজের মানসিকতাকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা, যাতে চারপাশের সবকিছু থেকে শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব হয়। চারপাশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার মেজাজ ও রুচি একদিকে যেমন মানুষের চিন্তানৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে, তেমনি মানসিক অবসাদ থেকে তাকে দেয় নিস্তার, প্রতিভাজগৎকে দেয় বিস্তার।

চিন্তাশীল ও চিন্তক মানুষটি হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে দিলের জানালার বাইরে দৃষ্টিটা একটু মেলে ধরে বলেই বাইরের রং-জগৎ তার ভেতরে প্রবেশ করে। তার বুকের অনেকটা জায়গাজুড়ে শুধু রং আর রং; সাদা, সবুজ, হলুদ, আকাশি। সৎ চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রসন্ন চোখ-মুখ দেখে মনে হয় সোনালি যুগের একখানা জলরঙা ছবি। তার স্বপ্নীল চাহনি যেন চাঁদের আসরে গেয়ে ওঠে সরস কাহিনির মধু মধু গান।

প্রত্যেক মানুষকে নিজের চিন্তাশক্তির ব্যাপারে হতে হয় জাগ্রতমস্তিষ্ক। চিন্তাশক্তিকে করতে হয় সর্বোচ্চ শানিত-তেজ। আর এভাবে ক্রমান্বয়ে নিজের চিন্তা বিশুদ্ধ হয়, হয় ঋদ্ধ ও পরিপুষ্ট। বিশুদ্ধ চিন্তার ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয় সুমহান কর্মের সুউচ্চ প্রাসাদ। চিন্তা শুদ্ধ হলে কর্মের যাত্রা হয় সঠিক ও গন্তব্যমুখী। গন্তব্যমুখী যাত্রাই একমাত্র পথিককে নিয়ে যেতে পারে আখেরি মনজিলের সোনালি সোপানে।

সমস্ত সমস্যা প্রথমে সৃষ্টি হয় মানুষের মন ও মননে। তাই মানুষ চাইলে তাকে মনের ভেতরেই সমাধি দিতে পারে। তবে এ জন্য দরকার অসাধারণ চিন্তাশক্তি। চিন্তাশক্তি সঞ্চয়ের জন্য দরকার চিন্তার সঠিক শীলন ও অনুশীলন। চিন্তার শুদ্ধি ও সমৃদ্ধির নিক্তিতে মেপেই বলা যায় একজন মানুষ কতটুকু সম্পন্ন, কতটুকু সম্পূর্ণ।

পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ আছে, যাদের থাকে রাশি রাশি আবিরের মতো সূর্যসঙ্কাশ চিন্তাশক্তি। বাজের মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চায় জীবনগ্রন্থের সবকিছু বা অনেক কিছু। এমন চিন্তাশক্তির চর্চা উদ্দীপনায় চাঙিয়ে তুলতে পারে সমস্ত অন্তরাত্মা—নিজের ও পরের।

চিন্তাগড়া বা সৃষ্টিশীল চিন্তাশক্তির কারণে যে একটি মামুলি বিষয়ও অসাধারণ অনন্যতা পায়, তা তুলে ধরতে দু-চারটি অণুগল্প ও ইতিহাসখণ্ডের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। একাগ্র-অন্বেষী মন নিয়ে পড়ে দেখুন, কেমন লাগে।

নবিদের প্রজ্ঞাদৃষ্টির একটি দীপ্তিমান দিক হলো, তারা 'না'কে 'হ্যাঁ'র মতো করে দেখতে জানেন। কারণ, প্রভুর এ পৃথিবীতে কোনো বিষয়ই নিষ্ঠুর পর্যায়ের সম্ভাবনাহীন নয়। সব অসম্ভবের ভেতরও ক্ষীণ সম্ভাব্যতা লুকিয়ে থাকে। লুকিয়ে থাকা জিনিসটা দেখার জন্য যে তীক্ষ্ণদৃষ্টি-দীপ্তি দরকার, তা নবিদের থাকে পর্যাপ্তরকম। এজন্যই তারা দেখেন।

***

মক্কা থেকে তায়েফ যাওয়ার পথে নবিজি একটি দুর্গম সরু পাহাড়ি পথ অতিক্রম করছিলেন। তিনি সাথিদের জিজ্ঞাসা করলেন—'এ পথের নাম কী?' তারা বলল—'আজ জয়্যিকাহ' (অর্থ : মুশকিল)। তিনি বললেন—'না না; বরং তার নাম "আল-ইউসরা" (অর্থ : সহজ)।'[১]

কী চমৎকার চিন্তাভঙ্গি দেখুন তো! মুহূর্তেই তিনি 'নেতি'কে 'ইতি' দিয়ে পরিবর্তন করে দিলেন। সফর-ক্লান্তির যন্ত্রণাবোধকে ঝরঝরে হালকা করে তোলার জন্য তিনি মিষ্টি চালে বললেন—পথ কীভাবে কঠিন-দুর্গম হয়? মুসাফিরের পথ তো হবে সহজ-স্নিগ্ধ-সুগম।

***

শফিক বালখি (মৃত, ১৯৪ হি.) ও ইবরাহিম বিন আদহাম (মৃত, ১৬২ হি.) ছিলেন সামসময়িক ব্যক্তি। শফিক বালখি একজন বিখ্যাত দুনিয়াবিমুখ সুফি। ইবরাহিম বিন আদহাম বিশাল বাদশাহি ছেড়ে দরবেশি অবলম্বনকারী একজন ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তিত্ব। বয়সে ও অভিজ্ঞতায় বড়ো ছিলেন ইবরাহিম বিন আদহাম। অনুজ শফিক বালখি তাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন।

একবার এক বাণিজ্য সফরে বের হচ্ছিলেন শফিক বালখি। তার আগে একটু সাক্ষাৎ করতে এলেন অগ্রজ ইবরাহিম বিন আদহামের সঙ্গে। সাক্ষাতের অল্প কদিনের মধ্যে বালখিকে মসজিদে দেখতে পেয়ে ইবরাহিম আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন—'এত অল্প সময়ে আপনি সফর থেকে ফিরে এলেন?' বালখি বললেন, আমি তো সফরেই যাইনি! কিন্তু কেন? প্রশ্নের উত্তরে বালখি খুলে বললেন তার দেখা রোমঞ্চকর ঘটনাটি—

> 'কিছু দূর গিয়ে যেখানে পৌঁছাই, তা ছিল নিতান্ত অনাবাদি জায়গা। জন নেই, প্রাণী নেই। ধু-ধু মরু, খাঁখাঁ বালিয়াড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাত নেমে এলো। আমি শিবির স্থাপন করলাম। তখন একটি চড়ুই নজরে পড়ল। খুব দুর্বল, উড়ালশক্তিহীন। তার প্রতি আমার খুব মায়া হলো। চোখ-মন ভিজে এলো হঠাৎই। খুব ভাবলাম—এমন বিরান ভূমিতে এমন দুর্বল চড়ুইটি খাবার কীভাবে পাবে, বাঁচবে কীভাবে? ভাবনার ভাঁজটা চেহারা থেকে মুছে যাওয়ার আগেই দেখি, আরেক চড়ুই এসে উপস্থিত। ঠোঁটে শক্ত করে চেপে আছে কিছু জিনিস। পঙ্গু চড়ুইটির পাশে আসার সাথে সাথেই ঠোঁটের জিনিসগুলো পড়ে গেল টুপ করে। অমনি পঙ্গু চড়ুইটি তা উঠিয়ে খেয়ে নিল। তারপর উড়ে গেল সুস্থ-সবল চড়ুইটি।
>
> এ দৃশ্য দেখে উচ্চৈঃস্বরে বললাম—"সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ যদি বিরান ভূমিতে পড়ে থাকা একটি পঙ্গু পাখিকে এভাবে রিজিক দিতে পারেন, তাহলে আমার মতো মানুষ কেন দেশ থেকে দেশান্তর চষে বেড়াবে?" এ ভাবনার ভেতর আচ্ছন্ন হয়ে ফিরে এলাম।'

ঘটনা শুনে ইবরাহিম বিন আদহাম বললেন—'শফিক! তুমি পঙ্গু পাখির মতো হতে চাইলে কেন? তুমি তো চাইলে সে পাখি হতে পারবে, যে বাহুশক্তি ব্যয় করে নিজেও খায়, অপরকেও

---

[১] ইবনে ইসহাক

খাওয়ায়।' এ কথা শোনার সাথে সাথে শফিক বালখি ইবরাহিমের হাতে চুমু খেয়ে বললেন—'আবু ইসহাক! আপনি আমার চোখের মোটা পর্দা সরিয়ে দিয়েছেন। আপনি যা বলেছেন, তা-ই সত্য, বিধিবদ্ধ ও প্রজ্ঞাময়।'

একই ঘটনা থেকে একজন নিলেন সাহসের সবক, আরেকজন হীনম্মন্যতার বা অযৌক্তিক তাওয়াক্কুলের। একেই বলে চিন্তার সার, চিন্তার ধার।

***

আরবি সাহিত্যে হাস্যরসাত্মক গল্পের একটি প্রসিদ্ধ চরিত্র আছে—নাম জুহা। তাকে ঘিরে কথিত আছে নানান মজার মজার গল্প। তারই একটা গল্প বলছি, যা আমাদের চিন্তাকে টনটন উত্তেজনায় চাঙা করে তুলবে।

বন্ধুদের মধ্যে তর্ক চলছে। বিষয়—পৃথিবীর সবচেয়ে দামি বস্তু কী? এমন তুঙ্গস্পর্শী তুমুল তর্কে জুহার নীরবতা দেখে বন্ধুরা অবাক! একজন বলল— 'জুহা! তুমি তো পণ্ডিত মানুষ। বিতর্কিত বিষয়ে তুমি যে কিছুই বলছ না? একটু মুখটা খোলো, দোস্ত!'

জুহা নিঃসংকোচে জবাব দিলো—'উপদেশকেই আমি পৃথিবীর সবচে দামি বস্তু মনে করি।'

বন্ধুরা এ উত্তর নিয়ে চিন্তা করল। আরেক বন্ধু সকৌতূহলে—'তাহলে কোন বস্তুটিকে পৃথিবীতে মূল্যহীন মনে করো তুমি?' 'আমি মনে করি—উপদেশই সেই বস্তু, পৃথিবীতে যার এক পয়সারও মূল্য নেই!' বলল জুহা।

এবার বন্ধুদের চেহারায় ফুটে উঠল অনন্য এক বিস্ময়। একজন হেসে জিজ্ঞেস করল—'জুহা! এ তুমি নিশ্চয়ই রসিকতা করছ! কিছুক্ষণ আগেই তো বললে, উপদেশই পৃথিবীর সবচেয়ে দামি বস্তু। আর এখন বলছ, এর এক পয়সারও মূল্য নেই। একই বস্তু মূল্যবান ও মূল্যহীন হয় কীভাবে?'

জুহা বলল—'বিষয়টি নিয়ে তুমি যদি প্রজ্ঞার সাথে ভেবে দেখো, তবে বুঝতে পারবে, আমি রসিকতা করছি না; বরং নিরেট সত্যটাই বলছি। যখন তুমি কোনো ব্যক্তিকে উপদেশ দেবে এবং তদানুযায়ী সে আমল করবে, তখন তোমার উপদেশটা পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান ও দামি বস্তু হবে। আর তুমি কাউকে উপদেশ দিলে, কিন্তু সে তা গ্রহণ করল না, তাহলে সেই উপদেশের এক পয়সারও মূল্য নেই! তাকে উপদেশ দেওয়া না দেওয়া বরাবর।'

বস্তুনিষ্ঠ চিন্তার মাধ্যমে মানুষ এভাবে একটি বস্তুর নানা কৌণিকতা খুঁজে বের করতে পারে। বড়ো অদ্ভুত মানুষের চিন্তার কারিগরি, ভাবনার কারুকাজ!

আমরা বঞ্চনা চাই না; চাই সফলতা। আমরা চাই আলোয় ভরা ভুবন, জোছনায় ভরা আকাশ। চিন্তার সূর্যালোকে স্নাত হলেই আমরা হতে পারি পরিচ্ছন্ন, পরিশুদ্ধ। সাফল্যের গোলাপি সুষমায় ভরে উঠুক আগামীর স্বপ্নশানিত জীবন!

মনোজগৎ ও মনোবিজ্ঞানী

'দুশ্চিন্তা বার্ধক্যকে ত্বরান্বিত করে।'[২]

এই বাণীর নিচে যদি পশ্চিমা কোনো বিজ্ঞানী বা দার্শনিকে নাম লেখা থাকে, তাহলে অনেকে শিহরিত শব্দে 'ওয়াও, ওয়াও' করে উঠবে। কী দারুণ সত্য কথা! এমন করে যে তারা বলতে পারেন! যদি বলি, এ বাণী ডেল কার্নেগি, রবিন শর্মা, এপিজে আবদুল কালামের কিংবা কোনো নামকরা মনোবিজ্ঞানীর, তাহলে সবাই বলবে—অসাধারণ তো! এজন্যই তো তাদের বই মিলিয়ন মিলিয়ন বিক্রি হয়। নিখাদ মুগ্ধতায় তাদের প্রশংসা করবে। নিজেদের ভুবনে তাদের স্বাগত জানাবে।

কিন্তু যদি বলি—এটি হাদিসের বাণী, তখন কী করবে জানেন? ভ্রুকুঞ্চিত ভঙ্গিতে বলবে—'ও! কোনো ওয়াজে মনে হয় শুনেছিলাম। অবাঞ্ছিত 'পরমুগ্ধতা' ভিমরুলের মতো আমাদের ছেঁকে ধরেছে। ঘরের সম্পদ হাতের কাছে ঢের পড়ে আছে। একটু হাত বাড়ালেই আঁচলভরে নিতে পারব, কিন্তু ওগুলোকে মনে হয় খুব সস্তা, খড়কুটোর স্তূপ।

দুশ্চিন্তা মানুষকে কুরে কুরে খেয়ে শেষ করে, ত্বরান্বিত করে বার্ধক্যকে—সে কথা আজ ছোটো-বড়ো সবাই জানে। দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য কত প্রকল্প, কত বই-পুস্তক, কত ক্লিনিক, কত কত মনোবিজ্ঞানের কোর্স! কত কাঠখড় পোড়ানো! দুশ্চিন্তা মানুষকে বুড়িয়ে দেয়—এ কথা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের আবিষ্কার বা থিউরি নয়। আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে বলে দিয়ে গেছেন শান্তির অগ্রদূত মুহাম্মাদ (সা.)। সেই সঙ্গে দুঃখ ও দুশ্চিন্তা কেন এবং কীভাবে সৃষ্টি হয়? সেটাও বাতলে দিয়েছেন—দুনিয়ার প্রতি অতি আগ্রহ দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দেয়।[৩]

সুন্দর-স্বর্গীয়-শান্তিময় একটি জগৎ ও মনোজগৎ রচনার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন আমাদের প্রিয় রাসূল (সা.)। সেই প্রেরণ-লক্ষ্যের স্বভাবদাবি ছিল—তিনি একজন দক্ষ মনোবিজ্ঞানীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। কারণ, প্রতিটি মানুষের চেহারা-সুরত যেমন ভিন্ন, তেমনিভাবে তাদের চিন্তাধারা ও অনুভব-অনুভূতিও ভিন্ন। আরও ভিন্নতর তাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা। ফলে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা ও মানসিকতার মানুষকে একই ধর্মের অভিন্ন শিবিরে সমবেত করতে হলে, তাদের মানসিকতা ও

---

২ . *আল-মাকাছিদুল হাসানা*, আল্লামা সাখাভি
৩ . বায়হাকি, মুসনাদে আহমদ

হৃদয়ের রহস্যালোকের গতিবিধি বোঝা অপরিহার্য ছিল। ফলে তাকে সে যোগ্যতা দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল।

সত্যস্পন্দিত ইতিহাসের দিকে একটু ফিরে তাকালেই আমরা দেখতে পাব— আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে সর্বমুখী শান্তি ও কল্যাণের দূত মহানবি (সা.) বহু মনস্তাত্ত্বিক সূত্রের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন নিজের জীবনে, তাঁর সঙ্গীদের জীবনে।

'দাঁড়ানো অবস্থায় কারও মাথায় রাগ চাপলে তাড়াতাড়ি বসে যাও। তাতেও রাগ প্রশমিত না হলে শুয়ে যাও।'[৪]

রাগ সংবরণের কী অদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা দেখুন! রাগ প্রশমের সাথে বসা ও শোয়ার কী সম্পর্ক? আপনি কি এখন 'বাহ বাহ' করে উঠবেন?

রাগের মাথায় মানুষ আজ কী-না করে বসছে! খুন-গুম থেকে শুরু করে ইতিহাসের ঘৃণ্যতম সব অপরাধই তো করে বসছে। রাগ সংবরণ করার কলাকৌশল বিষয়ে আজকের তথাকথিত মনোবিজ্ঞান কতই-না থিউরি ঝাড়ছে, অথচ মানবদরদি নবিজি সেই কবে বাতলে দিয়েছেন! আরেক হাদিসে আছে— 'রাগ করা শয়তানের অভ্যাস। শয়তান আগুনের সৃষ্টি। আগুন নিভে পানি দ্বারা। সুতরাং কারও যদি রাগ ওঠে, তাহলে সে যেন অজু করে নেয়।'[৫]

এ হাদিসদ্বয়ে রাসূল (সা.) রাগের মতো একটি মারাত্মক খারাপ ব্যাধির চমৎকার মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা বাতলে দিয়েছেন।

নতুন নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভব ও আবিষ্কারের জোয়ার-স্ফীত যুগে, মনোবিজ্ঞান একটি গবেষণামুখরিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মনোবিজ্ঞান আজ মানবজীবন থেকে দুঃখের সব গ্লানি মুছে দিয়ে নিরঙ্কুশ শান্তির শামিয়ানা প্রসারিত করছে বলে মনোবিজ্ঞানীরা দাবি করেন। মনোবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা-রচনা-গ্রন্থনা হয়েছে নানাভাবে, নানান আঙ্গিকে। এ বিজ্ঞান মানব-মনের গহিন-গভীর রহস্যালোক উন্মোচিত করেছে বলে অহংকার করে সংশ্লিষ্ট গবেষক ও রচয়িতাগণ। ইসলামবিদ্বেষী পশ্চিমারা তো নির্দ্বিধায় বলবে—এটা তাদেরই আবিষ্কার। এ সবুজাভ প্রান্তরে তাদেরই প্রথম পদপাত। অথচ আধুনিক মনোবিজ্ঞান থিউরির জোয়ার তো বইয়ে দিয়েছে, কিন্তু মূল সমস্যার সঠিক সমাধান দিতে সক্ষম হয়নি। এমন কোনো দিকনির্দেশনা দিতে পারেনি, যা অনুসরণ করলে সত্যি দুশ্চিন্তামুক্ত-সুন্দর-সুখময় একটি সমাজ গড়া যায়, হীনম্মন্যতায় দিশেহারা যুবকশ্রেণিকে নতুন জীবনে উদ্দীপ্ত করা যায় এবং ছোট্ট শিশু-কিশোরদের গড়ে তোলা যায় যোগ্যতর কর্মোদ্যমী সুনাগরিক হিসেবে।

মনোবিজ্ঞানের অন্যতম নীতি হলো—মানুষের মনে বিরাজমান হীনম্মন্যতাকে দূরীভূত করে তার স্থলে অটুট মনোবল ও সাহস দিয়ে ভরে দেওয়া, যাতে সে সহজে পতনোন্মুখ-পচনশীল মানসিকতা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। মানুষের ভেতর হীনম্মন্যতা সৃষ্টির পেছনে যে কারণটি সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল তা হলো—ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বর্ণ-বংশের ভেদাভেদ এবং

---

৪ . সহিহ বুখারিও মুসলিম

৫ . সুনানে আবু দাউদ

শ্রেষ্ঠতাত্ত্বিক মতভেদ। এ বিধ্বংসী ভেদ ও মতভেদকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য নবি (সা.) পুরো জীবন তো নিরন্তর চেষ্টা-সাধনা করেছেন-ই, ওপরন্তু বিদায় হজের ভাষণে সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—'তোমরা সকলে মাটির তৈরি আদমসন্তান। সুতরাং আরব-অনারব হওয়া এবং সাদা-কালো হওয়ার ভিত্তিতে পরস্পরের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব যা আছে, তা একমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতে।'[৬]

মানুষের উঁচুনিচু মানসিকতা, মহত্ত্ববোধ ও অধমত্ববোধ সৃষ্টির পেছনে দানবৃত্তি ও ভিক্ষাবৃত্তির যে অমোচ্য প্রভাব ক্রিয়াশীল, তার প্রতি ইঙ্গিত করে দানবীর নবি মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন—'নিজের হাত উঁচু রাখা নিচে রাখার চেয়ে উত্তম।'[৭] অর্থাৎ হাত নিচে রেখে ভিক্ষুকের আদলে নিজেকে উপস্থাপন করার কারণে নিজের ভেতর নীচুতা ও হীনম্মন্যতা সৃষ্টি হয়। আর নিজের হাতকে ওপরে রেখে দানবীরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে উঁচু মানসিকতা ও মহত্ত্ববোধ জাগ্রত হয়।

মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে সজীব-সুখময় করার জন্য রাসূলের সিরাত একটি উত্তম আদর্শ। শরীর ও আত্মার সর্বপ্রকার আরোগ্যের জন্যও রাসূলের সিরাতে রয়েছে উন্নত ও উত্তম চিকিৎসা। শরীরের সুস্বাস্থ্য ও শক্তি, আত্মার পরিচ্ছন্নতা ও মুক্তি, মস্তিষ্কের পেলবতা ও সুতীক্ষ্ণতা, ইচ্ছা-প্রতিজ্ঞার পরিমার্জন এবং অবদানের অনবদ্যতা ও মহত্ত্ব ইত্যাকার সবকিছুই রাসূলের আদর্শের অপরিহার্য ফলাফল। রাসূলের শিক্ষাদীক্ষা মানার মধ্যে শারীরিক ও আত্মিক উপকার ছাড়াও মনস্তাত্ত্বিক আরোগ্যেরও বিশাল এক প্রভাব রয়েছে।

সৃষ্টিগতভাবে মানুষ আল্লাহর কুদরতের একটি শাহি নিদর্শন। কোনো কিছু নিয়ে ভাবা, কোনো কিছুর তাৎপর্য অনুধাবন করা, সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং চারপাশের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার একটি শক্তি ও যোগ্যতা রয়েছে মানুষের ভেতর। মানুষ ভালো পরিবেশে বড়ো হলে এবং সঠিক নির্দেশনা পেলে সুকৃতির অধিকারী হয়। পক্ষান্তরে খারাপ পরিবেশে বড়ো হলে এবং ভুল নির্দেশনায় চালিত হলে নিশ্চয়ই ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট হয়। জড়িয়ে পড়ে নানা অপরাধে, অপকর্মে।

আল্লাহর রাসূল তা ভালো করেই বুঝতেন এবং বুঝতেন বলেই ব্যক্তির মানসলোকের অবস্থা বুঝে উত্তর ও সমাধান প্রদান করতেন। এজন্য দেখতে পাই—কখনো কখনো রাসূল (সা.) একই প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্নজনকে বিভিন্নভাবে উত্তর দিয়েছেন। যেমন :

তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো—'হে আল্লাহর রাসূল! কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম?' তিনি উত্তর দিলেন—'আল্লাহ ও রাসূলের ওপর ঈমান আনা, অতঃপর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, তারপর হজ করা।'[৮]

আরেকবার জিজ্ঞাসা করা হলো—'হে আল্লাহর রাসূল! কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম?' তিনি উত্তর দিলেন—'আল্লাহর ওপর ঈমান আনা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।'[৯]

---

[৬] মুসনাদে আহমদ

[৭] সহিহ বুখারি-মুসলিম

[৮] সহিহ বুখারি ও মুসলিম

[৯] প্রাগুক্ত

একই বিষয়ে আরেকবার জিজ্ঞাসা করা হলো—‘হে আল্লাহর রাসূল! কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম?’ তিনি উত্তর দিলেন—‘ঠিক সময়ে নামাজ আদায় করা এবং মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করা।’[১০]

দেখা যাচ্ছে, একই প্রশ্নের উত্তর রাসূল (সা.) এক-একজনকে এক-একভাবে দিয়েছেন। এ ভিন্নতার কারণ কী? হাদিসবিশারদগণ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু একটি ব্যাখ্যায় সকলে একমত—রাসূল (সা.) প্রশ্নকারীর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা বুঝেই ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিয়েছেন।

সুন্দর একটি মনোজগৎ রচনার জন্য এবং গতিময় চিন্তাশক্তি বিকাশের জন্য তিনি উম্মতকে দিয়ে গেছেন অসংখ্য আলোকিত চিকিৎসা ও পথনির্দেশ।

ভাবনার ভাঁজে ভাঁজে

[১০] প্রাগুক্ত